# অনুসন্ধানীর রহস্যভেদ - অজেয় রায়
# Anusandhanir Rahassabed by Ajeo Ray
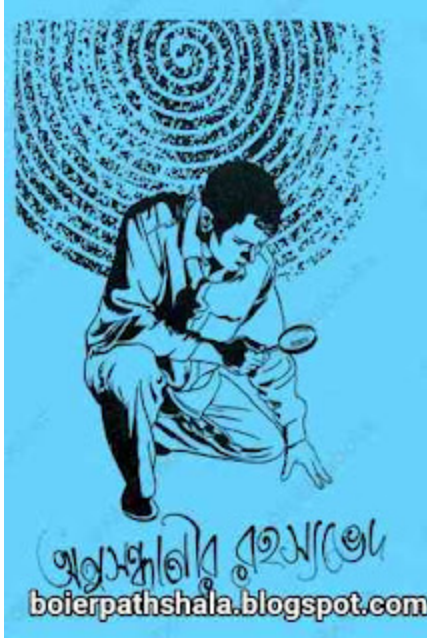
বিকেল প্রায় চারটে। দক্ষিণ কলকাতায় যতীন দাস রোডে একটি বাড়ির সামনে থামল জয়। ছোট দোতলা বাড়ি। দোতলায় ওঠার দরজার পাশে দেয়ালে কাঠের ফলকে লেখা-পুলক রায়, অনুসন্ধানী।

জয় কলিংবেল টিপল। দরজা খুলল হরিহর।

পুলকের পড়ার ঘর থেকে ডাক এল, "এসো জয়, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। আসছ কোত্থেকে?"

"ন্যাশনাল লাইব্রেরি।" "এক্ষুনি বেরোতে হবে। যাবে আমার সঙ্গে? সময় আছে?" "তা আছে। কী ব্যাপার?"

"চুরি। তবে ঠিক কী হয়েছে এখনও কিসসু জানি না। ব্যারিস্টার ব্যানার্জি টেলিফোন করেছিলেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে এক্ষুনি। তারপর জানা যাবে পুরো ব্যাপারটা। তবে ব্যানার্জিসাহেব যখন তাগাদা দিয়েছেন ব্যাপার নিশ্চয় ঘোরালো।"

'নাম আর ঠিকানাটা শুধু জেনেছি। নাম বিশ্বনাথ মজুমদার। নিবাস নিকটেই, সদানন্দ রোডে। বয়স্ক, বিপত্নীক। পয়সা আছে। ঠিকেদারি ব্যবসা করতেন।

ব্যানার্জিসাহেবের বিশেষ পরিচিত। একজন দক্ষ প্রাইভেট ডিটেটিভের খোঁজ চেয়েছেন। ব্যারিস্টার ব্যানার্জি আমার নাম করেছেন। চা খাবে?”

জয় বলল, "না। স্রেফ ঠান্ডা কুঁজোর জল। যা গরম, পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নিই।” জয় গা এলিয়ে বসল।

পুলক রায়ের বয়স ত্রিশ টুয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। পাকা ছ'ফুট লম্বা। দোহারা বলিষ্ঠ গড়ন। ধারালো মুখ। পরনে হাফ-হাতা শার্ট ও ট্রাউজার্স। কথা বলে ঠাণ্ডা গলায়।

জয়ের বয়স চব্বিশ। লম্বায় পুলকের কাছাকাছি। তবে কিঞ্চিৎ রোগাটে। রং ফর্সা। টিকালো না। বড়-বড় চোখ। পরনে পাঞ্জাবি ও পাজামা।

হরিহর জল আনল। এক চুমুকে গ্লাস নিঃশেষ করে, মিনিটখানেক জিরিয়েই খাড়া হল জয়, “চলো পুলকদা।” কালীঘাটে সদানন্দ রোডে মস্ত এক দোতলা বাড়ির সামনে থামল পুলক ও জয়। “এই বাড়ি," নোটবইয়ে লেখা ঠিকানার সঙ্গে মিলিয়ে জানাল পুলক। গেট ঠেলে ঢুকল দু'জনে। একফালি গাড়িবারান্দা পার হল। তারপর সদর দরজার কলিংবেল টিপল।

দরজা খুলে গেল, “কাকে চাই?” মাঝবয়সি একটি লোক উকি মেরে প্রশ্ন করল। তার গা খালি। খাটো ধুতি পরা। দেখে মনে হয় বাড়ির পরিচারক।

“বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার। বলবে, ব্যারিস্টার ব্যানার্জি পাঠিয়েছেন," বলল পুলক।

কৌতহলী চোখে কয়েক পলক আগন্তুকদের নজর করে লোকটি বলল, “বসুন, বাবাকে বলছি।”

বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসল পুলকরা। লোকটি ভিতরে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। ডাকল, “আসুন ওপরে, বাবুর ঘরে।”

প্রথমে বৈঠকখানা। গলিমোড়া দামি সোফাসেট সাজানো। দেয়ালে ফ্রেমে আটকানো বড়-বড় কয়েকটা ছবি। হাতে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে চওড়া বারান্দা। একটু বাঁয়ে হেঁটে ওপরে ওঠার সিড়ি। লোকটি সিড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল, পিছনে জয় ও পুলক। বাড়ির আকৃতি সেকেন্ড ব্রাকেটের

মতো। জয় এক নজরে দেখে নিল একতলাটা। সিমেন্ট বাধানো চৌকো মস্ত চত্বরে তিন দিক ঘিরে টানা-বারান্দা। বারান্দার লাগোয়া পর-পর ঘর। তাদের দেখে ঘোমটা টেনে সরে গেলেন লাল-পাড় শাড়ি পরা মাঝবয়সি খুব ফর্সা মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা। সিড়ি ভাঙতে ভাঙতে পুলক জিজ্ঞেস করল লোকটিকে, "বাবু নিচে নামেন না?" জবাব হল, "নামেন। আজ নামবেন না। বাতের ব্যথাটা বেড়েছে কিনা, তাই।"

দোতলায় সিড়ির মুখ থেকে কোনাকুনি ভাবে দুধারে রেলিং দেওয়া বারান্দা চলে গিয়েছে। এই তলাতেও অনেক ঘর। ঘরগুলোর দরজা-জানলার কোনোটার পাল্লা বন্ধ, কোনোটার পর্দা টানা। একটিও মানুষের দর্শন মিলল না। দোতলায় উঠেই, সোজাসুজি বারান্দায় দেওয়াল ঘেঁষে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা বড় অ্যাকোয়ারিয়াম। আর রেলিংয়ের ধারে ধারে খানিক তফাতে-তফাতে নিচু টুলের ওপর রাখা সুদৃশ্য চিনেমাটির টবে চারটি চার রকম ক্যাকটাসগাছ। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে নানা আকারের নুড়িপাথর, বালি ও আঁকাবাকা শুভ্র প্রবাল ফসিল। কয়েক জাতের বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির ছোট-ছোট মাছ খেলছে তার জলে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে দাড়িয়ে পড়ল পুলক। জয় জানে, এককালে পুলকের অ্যাকোয়ারিয়ামের শখ ছিল।

'রঙিন মাছ কে পোষে?" পুলক জিজ্ঞেস করে। "আজ্ঞে শিববাবু, উত্তর দেয় লোকটি। "আর ওই গাছ?" ক্যাকটাসগুলো দেখায় পুলিশ।

"গাছের শখ বড়দাদাবাবুর। ওধারে বারান্দাতেও আছে কয়েকটা। ওই যে লোকটি আঙুল দেখায়।

সিড়ি পাক খেয়ে উঠে গেছে ছাদে। সিড়ি, বারান্দার মেঝে, দেওয়াল ঝকঝকে তকতকে। সব মিলিয়ে এই বাড়ির বাসিন্দাদের সচ্ছল অবস্থা এবং সুরুচির পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে।

পথপ্রদর্শকের পিছু-পিছু সোজা চলেছে পুলকরা। হঠাৎ এক বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, "কে, কে?"

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পুলক ও জয়। সঙ্গের লোকটি ইঙ্গিত করল, এগিয়ে চলুন। অরপর সে নিচু গলায় বলল, "আজ্ঞে আমি ছোড়দাদু, গোবিন্দ। ঘর থেকে ফের প্রশ্ন হল, "ও। তোর সঙ্গে কারা?

বড়বাবুর কাছে এয়েছেন, গোবিন্দ নামে লোকটি জবাব দিল। বলতে বলতেই সে এগোয়। এবং পরের পরের ঘরের সামনে থামে। পর্দা ঢাকা দরজার সামনে গিয়ে গোবিন্দ বলল, “বাবু, ওঁরা এয়েছেন।”

“ভেতরে নিয়ে আয়,”ভারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে ঘরের ভিতর থেকে। গোবিন্দ পুলকদের বলল, "বাবু, জুতো বাইরে খুলে ঢোকেন।” জুতো খুলে, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল পুলক ও জয়। দরজার কপাট খোলাই ছিল।

ঘরের মাঝখানে এক পালঙ্ক। মাথার ওপর ঘুরছে ফ্যান। হলুদ-রঙা বেডকভারে ঢাকা বিছানায় একটা গোঙ্গা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধশোয়া মানুষটিকে দেখে ভয় থমকে গেল। শীর্ণ শরীর। শুকনো হর্তুকির মতো মুখখানা। টিয়াপাখির মতো বাঁকা নাক। ঘন পাকা চুল। দাড়ি-গোঁফহীন। সরু গোল পিতলের ফ্রেমে চশমার কাচের পিছনে ঈষৎ রক্তাভ দুই চোখে তীর চাউনি। গৌরবর্ণ কালের কুঞ্চনে বিবর্ণ। পরনে ধুতি ও সাদা ফতুয়া। বৃদ্ধ ধর দৃষ্টিতে পুলক ও জয়কে দেখে নিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন।

জয় এক নজর বুলিয়ে নিল ঘরে। ঘরটা বেশ বড়। প্রচুর আসবাব। কয়েকটি কাঠের চেয়ার। একটা স্টিলের আলমারি। দেয়াল-ব্যাকে অনেক বই ও বাঁধানো পত্রিকা। কোণে একটা টেবিলে কিছু ফাইল এবং কাগজপত্র। একটি আলনায় পাট করা কাপড়, গামছা ইত্যাদি। সবই সাজানো গোছানো। পুবের জানলাটা খোলা, তবে পর্দা টানা।

বৃদ্ধ ধীর স্বরে বললেন, “ব্যানার্জি পাঠিয়েছে?” ওই ক্ষীণ কাঠামোয় কণ্ঠস্বরটি কিন্তু আশ্চর্যরকম ভরাট।

“আজ্ঞে হ্যা,” জানাল পুলক।

“উত্তম, বসুন," বিশ্বনাথবাবু দেওয়াল ঘেষে রাখা চেয়ার দেখালেন। পুলক ও জয়। বসল। অতঃপর বিশ্বনাথবাবু গোবিন্দকে বললেন, “তুই এখন যা। বাইরে বারান্দায় থাক। কাউকে এখরে আসতে দিবিনে। বলবি আমার বারণ আছে। আমি এদের সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলব। দরজাটা ভেজিয়ে দিস।”

গোবিন্দ মাথা হেলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

আবার একপ্রস্থ পর্যবেক্ষণ। বিশ্বনাথবাবুর ললাটে কয়েকটি বাড়তি ভাজ পড়ে। তিনি পুলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ব্যানার্জি বলেছে কিছু?”

“সামান্যই। শুধু এটা একটা চুরির কেস, পুলকের জবাব।

হুম। আপনি পুলক রায়। অনুসন্ধানী। অর্থাৎ প্রাইভেট ডিটেকটিভ?” “হুম, ইয়াংম্যান। অভিজ্ঞতা আছে?” পুলক উত্তর দিল না। কেবল একচিলতে নীরব হাসি তার ঠোটের কোণে ঝিলিক দিল। “হঠাৎ এ-লাইনে কেন?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

পুলক বলল, “পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঙ্কে চাকরি করেছি বছরপাঁচেক। এই লাইনে কিছুটা অভিজ্ঞতা হল। তবে চাকরি ভালো লাগল না। ইচ্ছে হল স্বাধীনভাবে কাজ করি।”

“যাক, ব্যানার্জি যখন রেকমেন্ড করেছে, যোগ্য লোকই হবে”বুদ্ধের স্বগতোক্তি, ইটি কে?” বিশ্বনাথবাবুর চোখ এবার জয়ের ওপর।

“ওর নাম জয় দত্ত, "জানাল পুলক।

“আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট?

ওয়াটসন বুঝি?

পুলকের মুখে হাসি ফোটে। বলে, “হু, তাই হওয়ারই ইচ্ছে বটে।”

“আর কিছু করা হয়?” বুদ্ধের প্রশ্ন জয়কে লক্ষ করে।

জবাবটা পুলকই দিল - আপাতত ও মডার্ন হিস্ট্রিতে এম এ পাশ করেছে। ওকে বিশ্বাস করতে পারি ? ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।” তা পারেন,” বলল পুলক, “জয় আমার সঙ্গে আরও কেসে সাহায্য করেছে।

এ-লাইনের রীতিনীতি জানে।”

“চাটা কিছু খাবেন?” “এখন থাক,” বাধা দেয় পুলক। “হুম্।” বৃদ্ধ মাথা নিচু করে রইলেন অল্পক্ষণ। কী বলবেন গুছিয়ে নিচ্ছেন যেন মনেমনে।

বিশ্বনাথবাবু মুখ তুলে পুলককে বললেন, 'বুঝলে, আমার একটা আংটি চুরি গিয়েছে। এঃ, তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না। অবশ্য তোমরা আমার ছেলের বয়সি।”

“না, না, মনে করার কী আছে? তুমিই বলুন, পুলক আশ্বাস দেয়, “তারপর?" বিশ্বনাথবাবু বলেন, “সোনার আংটি। খুব ভালো একটা হীরে বসানো। আট-দশ হাজার টাকা দাম হবে।”

“কোথায় ছিল?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

“এই ঘরে। ওই আলমারিতে," দেওয়ালের গায়ে খাড়-করা স্টিলের আলমারিটা তিনি আঙুল তুলে দেখালেন। বললেন, “ওই আলমারির সাধারণ চাবি এবং লকারের চাবি দুইই ছিল আমার এই বিছানায়, মাথার বালিশের তলায়।” “কখন চুরি হয়েছে মনে হয়?” পুলকের প্রশ্ন।

গতকাল রাতে। রাত ন'টা থেকে ভোর সাতটার মধ্যে। চোর আমার বালিশের নিচে থেকে চাবি বের করে নিয়েছিল। চুরি করে ফের লকার এবং আলমারি বন্ধ করে চাবি দুটো যথাস্থানে অর্থাৎ আমার বালিশের তলায় রেখে দেয়। তবে ঠিক আগের জায়গায় রাখতে পারেনি, একটু বাইরে ছিল।” “রাত ন'টা থেকে সকাল সাতটা অবধি কি আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন?” বলল পুলক।

কারেই," জানালেন বৃদ্ধ। “এ ঘরে আর কেউ শোয়?”

“ঘরের দরজা খুলল কীভাবে?”

"কাল রাতে আমার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ছিটকিনি নিইনি। আমার হাঁটুতে বাত আছে। ব্যথা বাড়লে ঘরের দরজা রাতে ভেজানো থাকে। কারণ, যন্ত্রণা বেশি হলে গোবিন্দকে ডাকি। ও আমার পা টিপে দেয়, ওষুধ দেয়। জলতেষ্টা পেলে জল দেয়। আমার ঘর থেকে গোবিন্দকে ডাকার জন্য কলিংবেল আছে। বারবার উঠে দরজার ছিটকিনি খুলতে আমার তখন কষ্ট হয়। গোবিন্দ পাশের ঘরে শোয়, এই বারান্দার শেষ ঘরে। ওই আমার দেখাশোনা করে। কাল অবশ্য ওকে আমার প্রয়োজন হয়নি।

কারণ, কাল রাতে আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলুম। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আমার হাঁটুর থাটা খুব বাড়ে। তখন রাতে মোটে ঘুমাতে পারি না। তাই ওইসব রাতে ঘুমের

ওষুধ খেতে বাধ্য হই। গতকাল ছিল অমাবস্যা।”

“আপনি যে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ঘুমের ওষুধ খান, এ খবর কে কে জানে বাড়িতে?

“অনেকেই জানে, এটা কিছু গোপন ব্যাপার নয়।”

‘আলমারিতে আর-কোনো দামি জিনিস ছিল না?" বলল পুলক।

“ছিল বইকি,” বিশ্বনাথবাবু উত্তর দেন,

“এর চেয়ে ঢের ঢের দামি জিনিস। একগাদা জড়োয়া গয়না। দুটো হার, দু’সেট কানের দুল, তিনগাছি বালা। পাঁচটা আংটি, একসেট বোতাম। সব সোনার। কোনো-কোনোটায় দামি পাথর বা মুক্তো বসানো। এ ছাড়া ছিল তিনটে আলগা জুয়েল-স্টোন, দুটো চুনি এবং একটা পোখরাজ।”

“এসব আপনি ঘরে রাখেন!” অবাক হয়ে বলল পুলক।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, “মোটেই রাখি না। ব্যাঙ্কের ভল্টে থাকে। মাত্র তিন দিন আগে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছি ভল্ট থেকে। ইচ্ছে আছে এর ভিতর থেকে একটা গয়না। দেব আমার এক ভাইঝি’র বিয়েতে। শিগগিরি তার বিয়ে। বাকি গয়না লিস্ট করে উইল করে যাব, আমার অবর্তমানে কে কী পাবে। আমার অন্য সব সম্পত্তির উইল করা হয়েছে। শুধু এই গয়নাগুলো বাকি। উইল হলে গয়না আবার ব্যাঙ্কে রেখে আসব। গতকাল সন্ধ্যায় একবার গয়নাগুলো বের করে বসি। কিন্তু শরীরটা জুত না ঠেকায় লিস্ট করতে ইচ্ছে হয়নি। তুলে রাখি আলমারিতে। আজ সকাল সাড়ে দশটায় ফের বের করি। তখনই বুঝতে পারি একটা আংটি খোয়া গিয়েছে, এবং খেয়াল হয় চাবিটাও তো ঠিক জায়গায় ছিল না। ব্যানার্জিকে টেলিফোনে ধরতে দেরি হয়ে গেল। তুমি কখন খবর পেলে?"

“সাড়ে তিনটে নাগান,” জানাল পুলক। এবং বলল, “আচ্ছা, শুধু একটা আংটি নেওয়ার কারণ কিছু ভেবেছেন কি?”

“হয়তো চোর ভেবেছে শুধু মাত্র একটা আংটি মিসিং হলে আমি ধরতে পারব না। তাই মনে হয় এটা বাড়ির কারও কীর্তি। বাইরের চোর হলে সব কটাই যেত।

এবং এটা বুঝেছি, যে নিয়েছে সে বিশেষ জুয়েল চেনে না। কারণ ওখানে আর-একটা আংটি ছিল, যেটা নিয়েছে তার চেয়েও দামি।"

"নগদ টাকা ছিল কিছু লকারে?”

না। ক্যাশ আমি বাড়িতে খুব কমই রাখি। দরকারমতো ব্যাঙ্ক থেকে আনই। যা থাকে, তা আমার মানিব্যাগে। মানিব্যাগ ছিল আমার বিছানায় তোশকের তলায়। যখন চুরি টের পেলাম, বাড়ির পুরুষরা সবাই কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। তা নইলে সব্বাইকে আটকে রেখে বাড়ি সার্চ করতাম।

“গয়নাগুলো ছিল কীসে?" পুলকের প্রশ্ন।

“একটা রেশমি থলিতে।”

“ব্যাঙ্ক থেকে আপনার গয়না আনার খবর বাড়িতে কে কে জানে?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, “অনেকেই জানতে পারে। সেদিন আমার মেজো ছেলের সঙ্গে ওর গাড়িতেই ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। একই সঙ্গে ফিরেছি। এখন একা-একা বাইরের কাজ করতে কষ্ট হয়। তাই বেশির ভাগ সময় কাউকে হেল্প তে সঙ্গে নিই। এরপর খবরটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। গতকালই তো সকালে আমার বড় নাতনিটি বলে গিয়েছে “দাদ, গয়না এনেছ শুনলাম। দাও না পরে দেখি কেমন মানায়। দেখবে মুন্ডু ঘুরে যাবে।

আপনি পুলিশে খবর দিলেন না কেন?" পুলক জিজ্ঞেস করে। পুলিশ এলে হুলস্থুল লাগত। পাড়ায় জানাজানি হত। বাড়ির লোক মথ হয়রন করতআমি তা চাই না। এখনও এই চুরির কথা বাড়িতে কাউকে বলিনি। আমি ছাড়া আর-কেউ জানে না। অবশ্য আসল চোরটি বাদে।” “আমার কাছে স চান?" স্থির চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল পুলক।

থাসম্ভব গোপন অনুসন্ধান। দোষী কে জানতে চাই। আট-দশ হাজার টাকার জিনিস খোয়া গেলে আমার যে খুৰ গায়ে লাগবে তা নয়। কিন্তু একজন লোভী, অসৎ, এই বাড়িরই কেউ চুরি করে পার পেয়ে যাবে, সেটা আমার অভিপ্রায় নয়। আংটি উদ্ধার হোক বা নাই হোক, কে দোষী সেটুকু জানতে পারলেও হবে। আদালতে নয়, আমি স্বয়ং তার শাস্তির ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া লোভী চোর এ-

যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলে ভবিষ্যতে তার সাহস বাড়বে এবং আরও বড় অপকর্মে হাত দেবে। তাই কালপ্রিট কে, অন্তত সেটা তুমি বের করে দাও।”

পুলক ধীর স্বরে জানাল, “আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব।”

“উত্তম, বিশ্বনাথবাবুর মুখে খুশির বলক, “চেষ্টা করে দেখ। আংটিচোরকে ধরতে না পারলেও, তোমার চেষ্টার মূল্য, তোমার প্রাপ্য ফিজ আমি অবশ্যই দেব।”

“আজ্ঞে আমার চেষ্টা সফল না হলে আমি ফিজ নিই না,” সবিনয়ে জানাল পুলক।" “গুড, ভেরি গুড়। ব্যানার্জি ঠিক লোককেই পাঠিয়েছে।” এবার আমার কিছু প্রশ্ন আছে,” বলল পুলক। “বেশ, করো। আমি সাধ্যমতো উত্তর দেব, বিশ্বনাথবাবু জানালেন।

“প্রথমে জানতে চাই, এই বাড়িতে কে কে থাকে? কে শেন্ ঘরে? একতলায় এবং দোতলায়।”

বিশ্বনাথবাবু গড়গড় করে উত্তর দিয়ে গেলেন, “দোতলায় পশ্চিমে আমার পরে শেষ ঘরটীয় থাকে গোবিন্দ। তারপর আমার এই ঘর। এরপর বাথরুম। বাথরুমে আমার ঘর দিয়ে এবং বারান্দা দিয়ে ঢোকা যায়। তারপরের ঘরে থাকে নিশিকান্ত, আমার খুড়তুতো ভাই। এর পরের ঘরে আছে শিবু। শিবপদ। আমার নাতি হয় দূর সম্পর্কে।

সিড়ির ডাইনে উত্তরমুখো দুটো ঘর। প্রথমটায় থাকে আমার বড় ছেলে প্রমথ ও বড়

মা। তার পরেরটায় আমার বড় ছেলের একমাত্র মেয়ে কুমা। পূবদিকের বারান্দার লাগোয়া দুটো ঘর। একটা গুদাম। অন্যটা বড় বউমার ঠাকুরঘর।"

নিচের তলার ঘরগুলো একই প্যাটার্নের। এই অংশের তলায় থাকে আমার ছোট ছেলে চন্দ্রনাথ ও ছোট বউমা এবং ওদের পাঁচ বছরের ছেলে বুবাই। তারপর বাথরুম, হরেম। সিঁড়ির পাশের ঘরটা কঁকা থাকে। গেস্টরুম। আত্মীয়-স্বজন এলে থাকে।

গুলো খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার বাড়ির উত্তরে কম্পাউন্ডের ভিতর আভট হাউসে। থাকে বামুনঠাকুর, সপরিবারে।"

ক খানিক চুপ করে ভাবল। বুঝি মনে-মনে ছকে নিল বাড়িটা। তারপর বলল, এবার জানতে চাই, এই বাড়ির কে কী করেন, বয়স ইত্যাদি।

এবারও চটপট উত্তর হল, "আমার বড় ছেলে প্রমথ চাকরি করে একটা আধা-বিদেশি ফার্মে। ভালোই মাইনে পায়। তবে ইদানীং ও শেয়ার মার্কেটে ঝুঁকেছে শুনছি। বড় বউ সংসার সামলায়। শান্ত প্রকৃতির। মনটিও ভালো। বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল। নাতনি ঝম পড়ে কলেজ ফাটইয়ারে।"

"নিশিকান্ত অসুস্থ। আমারই বয়সি। ওর চোখ দুটোও গিয়েছে। একেবারেই প্রায় দেখতে পায় না। ওর একমাত্র ছেলে আছে বিদেশে। স্ত্রী মারা গিয়েছে। বারাকপুরে থাকত একা। আমি এখানে এনে রেখেছি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে অনেক খেলাধুলো হই-হল্লা করেছি। সেই টান। বাড়ির লোকের অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল না আর একটি রুগণ বৃদ্ধের ভার নেয়। আমি জোর করেই এনেছি। গোবিন্দই ওর সেবাযত্ন করে।"

"শিবু মানে শিবপদর দেশের বাড়ি হুগলির এক গ্রামে। আমার এখানে আসে কলেজে পড়তে। বার-দুই ফেল করে পড়া ছেড়ে ব্যবসা ধরেছে। ইলেকট্রিকের কাজ বেশ জানে। তার ইলেকট্রিক্যাল গুডসের দোকান দিয়েছে আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে। দোকান শুনেছি মল চলছে না। শুরুতে আমি তিন হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম পাঁচ বছরে শোধ করবে এই করে। চার বছরে মাত্র পাঁচশো টাকা শোধ দিয়েছে। তাগাদা লাগাচ্ছি। ছেলেটা বেশ খরচে। কিছু জমাতে পারে বলে মনে হয় না।"

"আমার ছোট ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। বছর-দশেক চাকরি করে আপাতত স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছে। ঠিকেদারি। কনস্ট্রাকশন-ফার্ম করেছে এক বন্ধুর সঙ্গে। বারণ করেছিলাম, শোনেনি। আসলে ওর পার্টনার বন্ধুটিকে আমার পছন্দ নয়। ভয় হয় লোকসান না দেয়। যাক গে, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ছোট বউমাটি কিঞ্চিৎ শৌখিন। বাইরে ঘোরেন বেশি। খরচেও আছে। আর কী জানতে চাও?

ঠাকুর-চাকর?" পুলকের প্রশ্ন।

"চাকর একজন, গোবিন্দ। একজন ঝি আছে, লক্ষ্মীর মা। আর আছে রাঁধুনি বামুন।"

"এদের কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?"।

"না। কারণ গোবিন্দ সন্দেহের উর্ধ্বে। আমার কাছে আছে তিরিশ বছর। অতি বিশ্বস্ত। বামুনঠাকুর এবং লক্ষ্মীর মা'ও পুরনো লোক। এবং বিশ্বাসী বলেই জানি। তা ছাড়া ওরা দুজন আমার ঘরে ঢোকে না। এ-ঘরে কোথায় কী থাকে ওদের পক্ষে জানার কথা নয়। আমার ঘরের যাবতীয় কাজ করে গোবিন্দ। এ-কাজ ঝি-চাকরের বলে আমার মনে হয় না। তারা গরিব মানুষ। অতগুলো দামি-দামি জিনিস হাতে পেয়ে মাত্র একটি সরিয়ে লোভ দমন করা? এতটা সংযম এবং বুদ্ধি? উহু, বৃদ্ধ মাথা নাড়েন।

পুলক বলল, "অর্থাৎ আপনি বোঝাতে চান, এই কাজ আপনার ছেলে বা আত্মীয়দের কারওঁ ?"

'হু, তাই। আর সেইজন্যেই ব্যাপারটা চাউর হোক আমি চাই না।"

"কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?" "প্রমাণ না পেয়ে কাউকে সন্দেহ করা কি উচিত? তবে মানুষের স্বভাব অতি বিচিত্রা আর লোভ বড় শক্তিশালী রিপু।"

পুলক মাথা ঝাকিয়ে সমর্থন করল বিশ্বনাথবাবুর যুক্তি। তারপর বলল, "আলমারির চাবি যে আপনার বালিশের নিচে ছিল এ-খোজ কে কে জানতে পারে?

অনাথবাবু বললেন, "এটা আমার পুরনো অভ্যেস। রাতে মাথার বালিশের তলায় রাবির চাবি রাখি। গোবিন্দ বা মা বিছানা তুলতে এসে অনেকবার দেখেছে। এর মুখ থেকে বাড়ির অন্যরাও জানতে পারে। আগে যখন ব্যবসা করতাম, খাওয়ার পর রাতে বসে হিসেপত্র দেখতাম। ক্যাশ মিলাতাম। তারপর সব আলমারিতে তুলে রেখে চাবি রাখতাম বালিশের তলায়। তবে আমার স্ত্রী যদ্দিন জীবিত ছিলেন, মেঝেতে শতরঞ্জি পেতে বসে কাজ করতাম। তারপর বসতাম বিছানায়। টেবিল-চেয়ারে বসে বেশিক্ষণ কাজ করা আমার পোষায় না। দিনে অবশ্য চাবি থাকে এই ঘরে, একটা গোপন জায়গায়। তবে চুরি টের

পাওয়ার পর চাবি এখানেই আছে। এই যে-” বিশ্বনাথবাবু বেডকভার তুলে বালিশের তলা হাতড়ে দু'টি লম্বা চাবি বের করে দেখালেন।

তিনি তিক্ত হেসে বললেন, “সাধারণ অবস্থায় কেউ আমার বালিশ হটিকালে ঠিক টের পেতাম। আমার ঘুম খুব পাতলা। তবে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ফলে, হু, বলতে পারো কেয়ারলেস হয়েছি। তবে কিনা আমার ঘর থেকে কখনও একটি জিনিসও চুরি যায়নি। বাড়ির কারও এতখানি দুঃসাহস হবে ভাবতে পারিনি।”

বিশ্বনাথবাবু, ভুরু কুঁচকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখে ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন। ঘরের ঝকঝকে মসৃণ মেঝের দিকে তাকিয়ে পুলক বলল, “এই ঘর যখন মোছা হয়?" “প্রতিদিন সকাল এগারোটা নাগাদ,” উত্তর দিলেন বিশ্বনাথবাবু। ‘আজকে কি মোছা হয়েছে?”

“না। আজ সকালে ঘটনাটা বুঝতে পেরেই আমি গোবিন্দকে এই ঘর ঝাট দিতে বা মুছতে নিষেধ করি। কারণটা বুঝেছ? ফিংগারপ্রিন্ট।"

“হু, ঠিক করেছেন,” বলল পুলক,

“আচ্ছা গতকাল মোছর পর এ-ঘরে আপনি ছাড়া আর কে কে ঢুকেছে?”

“গোবিন্দ, বড় বউমা। এবং তোমরা দু'জন। এ-ছাড়া আর একজন, যার পরিচয় 'আমি জানি না।” “অর্থাৎ যে চুরি করেছে?”

“বড় বউমাকে আপনার সন্দেহের লিস্ট থেকে তা হলে বাদ দিচ্ছেন?” বলল পুলক।

“না, না, জোর দিয়ে তা অবশ্যই বলতে পারি না। তবে কিনা...” বিশ্বনাথবাবুর মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বোঝা গেল।

“আপনার বড় বউমা কী করতে ঘরে ঢুকেছিলেন?” জিজ্ঞেস করে পুলক।

“খাবার দিতে। বাতের ব্যথা বাড়লে আমি নিচে খাবার ঘরে খেতে যাই না। এই ঘারই থাই। ওই টেবিলটায়। বউমা দুপুর আর রাতের খাবার নিয়ে আসে। গোবিন্দ আনে চা অলখাবার। এ ছাড়া বউমা দু’বার ওষুধ খাওয়াতে এসেছে।”

পুলক চেয়ার ছেড়ে উঠল। ঘরে মেঝের ওপর চোখ রেখে গোটা ঘরে ধীরে ধীরে চক্কর খতে লাগল। পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল। কখনও-কখনও উবু হয়ে বলে ওই কাচের ভিতর দিয়ে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করল মেঝের জায়গায় জায়গায়। রে সে চেয়ারে এসে বসে প্রশ্ন করল, “জুতো মানে শু পায়ে কেউ ঢুকেছিল এই ঘরে?”

"শ্যু” বিশ্বনাথবাব ভুরু কুচকেন, "না। এ ঘরে রাস্তায় সোয়া চট, জুতো পরে কোন আমি পছন্দ করি না। বউমা বা গোবিন্দ ঢোকে খালি পায়ে। আমি নিজেও বাইরের জলে বারান্দায় খুলে ঘরে ঢুকি। গোবিন্দ সেটা ঝাড়পোছ করে ঘরে রাখে।”

“কিন্তু শু পায়ে ঢুকেছিল কেউ," দৃঢ় স্বরে জানাল পুলক, “আমি ছাপ দেখছি।”

“তা হলে সেই নির্ঘাত চোর।” রাগে গরগর করে ওঠেন বৃদ্ধ। শুধু চুরির অপরাধে নয়, তার ঘরে জুতো পায়ে ঢোকাও মনে হল তাঁর রাগের কারণ।

“চণ্ডীবাবুকে একবার ডেকে আনা দরকার। আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?” জুতোর প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বিছানার পাশে টুলে রাখা টেলিফোন-যন্ত্রটি দেখাল পুলক। বিশ্বনাথবাবু বললেন, “বিলক্ষণ। চণ্ডীবাবু কে?"

“ফিংগারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। আগে পুলিশে ছিলেন। রিটায়ার্ড। এখন প্রাইভেট কাজ করেন। ওঁর ওপরের গাটে ফোন আছে চন্তীবাবুকে চাইলে ডেকে দেয়।"

চণ্ডীবাবু এলেন আধ ঘন্টার মধ্যে। মাঝারি লম্বা, পোক্ত গড়ন। ছোট করে ছাঁটা কাচা-পাকা চুল। রং রোদে পোড়া তামাটে। গম্ভীর, ভারিক্তি ধরন। গোবিন্দ তাকে পৌছে দিল বিশ্বনাথবাবুর ঘরের দোর অবধি। চণ্ডীবাবুও জুতো খুলে মোজা পায়ে ঘরে ঢুকলেন। পুলক তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বিশ্বনাথবাবুর। একটি সংক্ষিপ্ত নমস্কার জানিয়ে চণ্ডীবাবু চেয়ার নিলেন।

পুলক কাজের কথায় এল, “এই ঘরের মেঝেতে বিশেষ করে ওই আলমারির সামনে পায়ের ছাপ যা পাবেন প্রিন্ট চাই। মনে হচ্ছে জুতোর ছাপও রয়েছে। আর বিশ্বনাথবাবু এবং গোবিন্দর হাত ও পায়ের প্রিন্টটাও নেবেন।” চণ্ডীবাবু অত্যন্ত দক্ষতায় কাজ শুরু করলেন।

জয় আগে চণ্ডীবাবুর কাজের পদ্ধতি দেখেছে। তবে বিশ্বনাথবাবু মহা কৌতুহলে গলা বাড়িয়ে লক্ষ করতে থাকেন।

সন্দেহজনক ছাপের ওপর বিশেষ ধরনের পাউডার ছড়িয়ে হালকা ব্রাশ করতে ছাপ স্পষ্ট হয়। এরপর চণ্ডীবাবু ক্যামেরা বের করে ফ্ল্যাশ-বাঘের সাহায্যে অনেকগুলি ছাপের ফোটো তুললেন।

জয় ফিসফিস করে পুলককে বলল, "আলমারির হাতল আর চাবিগুলো দেখবে না? চোরের আঙুলের ছাপ পেতে পারো।”

উত্তর হল, “লাভ নেই। বিশ্বনাথবাবুর আঙুলের ছাপে অপরাধীর ফিংগারপ্রিন্ট মুছে গিয়েছে।”

পুলক ফের মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে কয়েক জায়গা লক্ষ করল। একটা কলারের সাহায্যে কিছু মাপ নিয়ে টুকে রাখল নোটবইয়ে। টেবিলের ওপর রাখা প্লাস্টিকের ঢাকাসুদু কসার গেলাসটা দেখিয়ে বলল, “এটা শেষ কে ধরেছে?

বড় বউম", জানালেন বিশ্বনাথবাবু। “তা হলে এটাও চাই,” বলল পুলক, দু-একদিনের জন্য।” চণ্ডীবাবু গেলাসটা কাগজে মুড়ে ব্যাগে ভরলেন।

দু'টি সুন্দর নকশা-কাটা বাক্স দুটো খালি। পুলক বাক্স কে চাবি দিয়ে বারকয়েক আলমারি খুলল, বন্ধ করল। গয়নার রেশমি থলিটি ছাড়াও নকশা-কাটা ছোট-ছোট কাঠের বাক্স ছিল লকারে। বিশ্বনাথবাবু জানালেন যে, টো খালি। পুলক বাক্স দুটো চেয়ে নিয়ে চণ্ডীবাবুর হেফাজতে দিল। যদি ফিংগারপ্রিন্ট মেলে! বলা যায় না অপরাধ হতো ওই গগুলোও খুলেছে।

চণ্ডীবাবু বিদায় নিলেন।

পুলক বলল, “এবার আমরাও যাব। আবার কবে আসৰ বলতে পারছি না। বোধহয় -চারদিনের মধ্যেই। আপনার বাড়ির লোকজনদের সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে গোপনে। ইতিমধ্যে আপনি কাউকে কিছু বলবেন না এ-বিষয়ে। হয়তো আপনার বাড়ির লোককে জেরা করার দরকার হতে পারে ভবিষ্যতে।"

“বেশ, বিশ্বনাথবাবু সম্মতি জানালেন। “তারা রাজি হবেন তো আমার প্রশ্নের জবাব দিতে?”

“আলবত রাজি হবে। আমার হুকুম। তা নইলে আমি সত্যি পুলিশে খবর দেব। তাতে তাদের সম্মান কমবে বই বাড়বে না।”

পুলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমার কাজের বিষয়ে আগেই বলেছি। তবে চণ্ডীবাবুর বিলটা পরের বার আনব, মিটিয়ে দেবেন। হ্যা, বাড়ির কাউকে আমাদের পরিচয় এখন দেবেন না। কেউ কৌতুহল দেখালে বলবেন—আচ্ছা আপনার কোনো মামলা চলছে কি?"

বিশ্বনাথবাবু বললেন, “একটা কেন, দু-দুটো মকদ্দমা ঝুলে আছে। ব্যানাজিই আমার। ল-ইয়ার। সম্পত্তি থাকলেই এসব ঝক্কি থাকে।”

“বেশ বেশ, তা হলে বলে দেবেন, আমরা ব্যারিস্টার ব্যানার্জির লোক। মামলার কাজে এসেছি। অবশ্য পরে আমাদের আসল পরিচয় জানাজানি হবে ঠিকই," বলল পুলক।

নিশিকান্তবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে চলেছে পুলকরা, সেই খনখনে গলা ভেসে এল। আধখোলা দরজার ওধার থেকে, “কে কে?

“আজ্ঞে সেই বাবুরা ফিরছেন,” জবাব দিল গোবিন্দ। যেতে যেতে গোবিন্দ দুঃখিত স্বরে বলল, “নিশিকান্তবাবুর ভারি কষ্ট। হাঁপানির টানটা বেড়েছে। কদিন মোটে ঘুম হচ্ছে ঠায় জেগে বসে থাকেন।”

রাস্তায় যেতে যেতে জয় বলল, “পুলকদা, বিশ্বনাথবাবুর বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে তোমার গুপ্তচর বাহিনীকে লাগাবে, তাই না?"

‘কারেক্ট।” পুলক মাথা ঝাকাল।।

পুলকের কিছু গুপ্তচর আছে। তাদের কয়েকজনকে দেখেছে জয়। এরা নানা ধরনের, নানা বয়সি লোক। কারোকে দেখতে নেহাত গোবেচারা, যেন অফিসের বাবু। কেউ দারুণ

স্মাট, চালাক-চতর। কেউ মাস্তান টাইপের। পয়সার বিনিময়ে এরা পুলকের নির্দেশে নানা খোজখবর জোগাড় করে দেয় গোপনে। কয়েকজন মেয়েও নাকি আছে এই দলে। কীভাবে এদের জোটাল পুলক, জয় তা জানে না। এরা সবাই নাকি পুলকের বেজায় ভক্ত এবং বিশ্বাসী।

**গল্পের পরের অংশ পড়ুন এখানে**

## দুই

বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি পুলকরা প্রথমবার গিয়েছিল মঙ্গলবার। শুক্রবার সকালে জয় পুলরে বাড়ি যেতেই পুলক বলল, “আজ দুপুরে একবার মজুমদার বাড়ি যাব, তিনটে নাগাদি। বিশ্বনাথবাবুর দিবানিদ্রার ব্যাঘাত হবে, কিন্তু উপায় নেই। কারণ ওই সময়টা মজুমদারবাড়ি বেশ ফাকা থাকে। তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?”

“আলবত যাব,” জানাল জয়। “তা হলে চলে এসো আড়াইটের মধ্যে।” জয় বলল, “মজুমদারবাড়ির লোকদের সম্বন্ধে খোজখবর কীরকম পেলে?” পুলক বলল, ই, আমার সিক্রেট সার্ভিসের রিপোর্ট কিছু মিলেছে শুনবে?” “হ্যা, হা।” জয়ের বেজায় কৌতুহল। পুলক বলে, “সন্দেহটা আপাতত কয়েকজনের ওপর সীমাবদ্ধ রেখেছি বিশেষ কারণে। এদের মঙ্গলবারের গতিবিধিটা খুব ইমপর্টেন্ট।

কারণ সোমবার রাতে আংটি চুরি করলে পরদিনই হয়তো চোর সেটা পাচার করার চেষ্টা করবে। এক এক করে বলছি। চা খাবে তো? হরিহর, চা..

"বেতের চেয়ারে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে খানিক আপনমনেই বলে চলে পুলক, বিশ্বনাথবাবুর বড় ছেলে প্রমথনাথ সেদিন যথারীতি সকাল সাড়ে ন'টায় অফিসের পথে রওনা হয়েছিলেন। উনি মিনিবাসে অফিস যান। পাড়ার আরও কয়েকজন ডালহৌসিতে অফিস করতে যায় ওই একই বাসে। তারা সাক্ষী।"

"অফিসে টিফিনের সময় উনি বেরিয়েছিলেন। নাকি এক বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কাছের এক রেস্তোরায়। ফেরেন সওয়া দুটোয়। বন্ধুর রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন ঠিকই। তবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন পৌনে দুটোয়। ওই রেস্তোরাঁ থেকে ওর অফিস পৌছতে পাচ মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়। সুতরাং বাকি পঁচিশ মিনিট কী করেছেন?"

"অবশ্য অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি করেননি। ঠিক সময়েই বাস ধরে ফেরেন। সন্ধে সাতটায় আবার বেরোন। ফেরেন ন'টা নাগাদ। কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলতে গিয়েছিলেন। তাস খেলা হয়েছিল ঠিকই। তবে সেখানে যাওয়া-আসার পথে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন কি না বা বন্ধুর বাড়ি তাস খেলা ছাড়া আর কিছু করেছেন কি না এখনও চেক-আপ করা যায়নি।"

এবার দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রনাথ। ইনি এখন প্রতিদিন বেহালায় কাজে যান সকাল ন'টা নাগাদ, ব্রেকফাস্ট সেরে। এখানে একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হচ্ছে, উনি সেটা তৈরির কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন। মঙ্গলবারও ঠিক সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ন'টায় হাজির হন স্পটে। এগারোটায় সেখান থেকে যান ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এক পাটির সঙ্গে লাঞ্চ সারেন পার্কস্ট্রিটের এক হোটেলে। ফের যান বেহালায় বেলা দুটোয়। সেখানে থাকেন চারটে। অবধি। বাড়ি ফেরেন সাড়ে চারটেয়। সন্ধে ছ'টায় বেরিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে। রাত। সাড়ে আটটায় বাড়ি ফেরেন। রবীন্দ্রসদনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন দু'জনে। চন্দ্রনাথের নিজের মোটর আছে। তাতেই যাতায়াত করেন। ব্যাঙ্কে বা হোটেলে যাওয়া-আসার পথে 'অন্য কোথাও ঢু মেরেছিলেন কি না জানা যায়নি। হ্যা, মেজোগিন্নি সন্ধে বেরুবার আগে পর্যন্ত বাড়িতেই ছিলেন।"

এবার শিবু। শিবুর অভ্যেস চা-টা খেয়ে সকাল আটটায় ওর দোকানে যাওয়া। দুপুরে সায় একটায় বাড়িতে খেতে আসে। খানিক বিশ্রাম করে। তিনটে নাগাদ

ফের দোকানে যায়। রাত আটটায় দোকান বন্ধ হলে কোনো-কোনোদিন তক্ষুনি একবার বাড়ি ঘুরে গিয়ে বার হয়। কখনও কখনও ফেরে একদম রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়, আড্ডা মেরে বা সিনেমা-টিনেমা দেখে। মঙ্গলবার ও রাত সাড়ে আটটায় বাড়ি এসে চা খেয়ে ঘণ্টাখানেক বাইরে ঘুরে আসে। হাজর-মোড়ের বান্ধব কাফেতে আল্লা মেরেছে। অবশ্য পুরো সমাটা ওইখানেই কাটিয়েছিল কি না এখনও ঠিক জানি না।”

পুলক থামল। জয়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী বুঝলে?"

"বুঝলাম, মজুমদার বাড়ি থেকে এই যারা বাইরে বেরিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই আংটি পাচার করার সুযোগ পেয়েছে, উত্তর দিল জয়।

পুলক চিন্তিতভাবে বলল, ", সেটাই মুশকিল। দেখা যাক। তবে আমার এজেন্টরা এই ক'জনকে সমানে ফলো করে যাচ্ছে। খুটিনাটি খোঁজ নিচ্ছে। যদি কোনো পাওয়া যায়?

দুপুর তিনটে বাজে। ঝা-বা রোদ। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিক থেকে সদানন্দ রোড ধরে পায়ে হেঁটে এগুচ্ছে পুলক ও জয়। সহসা ঝলমলে শার্ট ও চোঙা ফুলপ্যান্ট পরা কাপ্তেন টাইপের এক ছোকরা এসে দাঁড়াল সামনে। পুলক থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটিকে, “কি, লাইন ক্লিয়ার ?”

“ইয়েস স্যার," ছেলেটি উত্তর দিল।

“কোথায় গেছে?”

“দোকানে।”

“অল রাইট। তোমার এখন ডিউটি অফ;" পুলক ছেলেটিকে জানাল, “চলো জয়।” পুলক ফের এগোল মজুমদার-বাড়ির উদ্দেশে।

“কে দোকানে গেছে," উৎসুক জয় প্রশ্ন করে।

“শিবপদ। দিবানিদ্রা সেরে আপাতত তার দোকানে ফিরেছে।”

গোবিন্দ বোধহয় অপেক্ষায় ছিল। কারণ কলিংবেল টেপা মাত্র সে দরজা খুলে দিল। গোবিন্দ যখন পুলকদের বিশ্বনাথবাবুর ঘরে পৌঁছে দিল, মজুমদার-বাড়ি তখন নিঝুম। কেবল চোখের আড়ালে কলতলায় বাসন মাজার ঠুনঠান আওয়াজ কানে আসছে। গোবিন্দ বিশ্বনাথবাবু এবং নিশিকান্তবাবু ছাড়া আর কেউই বোধহয় টের পেল না পুলকদের আগমন।

নিশিকান্তবাবুর কান ফাকি দেওয়া যায়নি। ওর ঘর পেরোবার সময় আধখোলা দরজার ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, "কে?"

পর মুহূর্তে নিজেই জবাব দিলেন, "ও গোবিন্দ। আর সেই দু'জন বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যা," জানাল গোবিন্দ। বিশ্বনাথবাবুকে দেখে মালুম হল, তিনি সবে দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন, বালিশের ওপর 'তাকিয়া চাপিয়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

"কী হে অনুসন্ধানী, কদূর এগোল কে?" পুলক ঘরে ঢোকামাত্র জানিতে চাইলেন বিশ্বনাথ মজুমদার।

"আজ্ঞে এখনও এগোয়নি বিশেষ। হাতড়াচ্ছি," পূলক জবাব দিয়ে কিন্তু বলল না। জয়কে বলল, "তুমি এ-ঘরে অপেক্ষা করো। আমি গোবিন্দর সঙ্গে ক'টা কথা বলতে চাই প্রাইভেটলি। চলো গোবিন্দ তোমার ঘরে।" পুলক কাউকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই গোবিন্দকে একরকম ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বনাথবাবু তির্যক চোখে দেখলেন ব্যাপারটা। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। পুলক ও গোবিন্দ চলে যেতেই বিছানায় আধশোয়া হয়ে চোখ বুজলেন। অগত্যা জয় টেবিলে রাখা দৈনিক পত্রিকাটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল। মিনিট দশ-বারো বাদে এর কানে এল পায়ের শব্দ। পুলক বিশ্বনাথবাবুর ঘরে ঢুকল না, সামনে দিয়ে চলে গেল। খানিক এগিয়ে থামল পদশব্দ। অল্প কথাবার্তার আওয়াজ। নিশিকান্তবাবুর চেরা কণ্ঠস্বর। এরপর আর কিছু শোনা যায় না।

"গোবিন্দ," ডাকলেন বিশ্বনাথবাবু।

"আজ্ঞে ?" সাড়া দিয়ে ঘরে ঢোকে গোবিন্দ।

“পুলকবাবু কোথায়?” “আজ্ঞে নিশিদাদুর সঙ্গে কথা বলছেন, ওঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে।”

“ঠিক আছে, তুই যা।” গোবিন্দ বিদায় নিল।

পুলক নিশিবাবুর ঘর থেকে বেরোল মিনিট কুড়ি বাদে। ফের সে গোবিন্দকে বারান্দার কোণে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ঢুকল বিশ্বনাথবাবুর ঘরে।

জয় ও বিশ্বনাথবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পুলকের দিকে। পুলকের কিন্তু ক্ষেপ নেই। সে নির্বিকার। তবে জয়ের ঠাওর হল পুলকের মুখে একটা চাপা খুশির আভাস। পুলক দিব্যি খোশমেজাজে গোবিন্দকে ডাক দিয়ে বলল, “এক কাপ চা খাওয়াতে পারো? তবে অন্য কাউকে বিরক্ত করা চলবে না। তোমায় নিজে বানাতে হবে। স্রেফ চা। মাথাটা বেশ ধরেছে। জয়, তুমি খাবে? বেশ, দু কাপ চা। কী বিশ্বনাথবাবু, অসুবিধা হবে?"

বিশ্বনাথবাবু উঠে বসে খরদৃষ্টিতে দেখছিলেন। তিনি ইশারায় গোবিন্দকে চা আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

যেই গোবিন্দ গেল অমনি পুলক বলল, 'জয়, তুমি কাগজ পড়ো, আমি বারান্দায় একটু পায়চারি করি। বারান্দা থেকে বাড়িটা একবার সার্ভে করতে চাই," বলেই সে বেরিয়ে গেল।

জয় মুখ কালো করে খবরের কাগজ রেখে এবার টেবিলে রাখা পাজিটা নিয়ে ওলটাতে লাগল। পুলক কথার সুরে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে একা থাকতে চায়। তাই জয় বাধ্য হয়ে পুলকের সঙ্গ ধরতে পারল না। বিশ্বনাথবাবু চোখ পিটপিট করে স্বগতোক্তি করলেন, গোবিন্দকে সরিয়ে দিল এবং ওয়াটসনকেও সঙ্গে নিল না, হুম।" তিনি ফের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঝিমুতে লাগলেন।

গোবিন্দ চা আনল মিনিট-পনেরোর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরল পুলক। চায়ে চুমুক দিল, “আঃ'। তারপর বলল, “গোবিন্দ, একবার কষ্ট করবে? তুমি নিচে গিয়ে মালিক গারের সামনে দাঁড়িয়ে দেখো। আমি এই সামনের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাব। লক্ষ করবে, আমায়। তুমি দেখতে পাও কি না?”

“আজ্ঞে তা দেখা যাবে, জানাল গোবিন্দ, “আমি নিজে কতবার দেখেছি।"

"আচ্ছা মালির ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় এই বারান্দা?"

"আজ্ঞে হ্যা, যায়।"

"বেশ, বেশ," পুলক খুশি হয়ে ওঠে। সে ঘড়ি দেখে বলল, "এখন চারটে দশ। প্রমথবাবু অফিস থেকে ফিরবেন কখন?"

"আজ্ঞে তা ছটা বাজবে," গোবিন্দ জানায়।

"আয় চন্দ্রনাথবাবু?"

"তার ফেরার ঠিক নেই।"

"শিবপদবাবু?"।

"ওঁনারও কিছু ঠিক নেই। কোনো দিন আটটা সাড়ে-আটটায় ফেরেন। কখনও আরও দেরি হয়।"

"ও আচ্ছা," বলল পুলক, "বিশ্বনাথবাবু, আমরা এখন চলি। আবার আসব সাড়েপাঁচটা নাগাদ। আপনার বাড়ির কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। গোবিন্দ, পারলে তুমি ওই সময় সদর দরজায় থেকো। যতটা সম্ভব চুপচাপ এই ঘরে ঢুকে পড়ব, কেমন?"

পুলক ও জয় বিদায় নিল।

বিকেল পাঁচটা পয়ত্রিশে মজুমদারবাড়ির দোতলায় উঠে জয় দেখল, একটি সুশ্রী তরুণী প্রমথবাবুর ঘরের সামনে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। নিশ্চয় ও প্রমথনাথের কন্যা ঝুমা। হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ, গম্ভীর চালে পুলক ধীর। পদক্ষেপে প্রবেশ করল বিশ্বনাথবাবুর ঘরে। পিছু-পিছু ব্যাগ হাতে জয়। ভাবখানা, যেন কোনো জরুরি মোকদ্দমার কাজে তাদের আগমন। গোবিন্দকে বলা হল যে, প্রমথবাবু এলেই যেন তাকে সোজা নিয়ে আসা হয় এই ঘরে।

বিশ্বনাথবাবু বিছানায় বসেছিলেন যথারীতি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পুলক তার মাথার কাছে খাটের ধারে চেয়ার টেনে বসল। সে জয়কে বল, "তুমি আমার

পিছনে চেয়ারে বাসো।” পুলকের সামনে রইল একটা ফাকা চেয়ার।

পুলক এবার খোশগল্প জুড়ে দিল। কয়েকটি পরামর্শও হয়ে গেল তদন্তের ব্যাপারে। একবার লঘু পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বারান্দায়। বোঝা গেল কৌতুহলী ঝুমা পাক খেয়ে গেল সামনে দিয়ে।

আধঘণ্টাটাক বাদে। ভারী পায়ের শব্দ বারান্দা দিয়ে এসে থামে পর্দার বাইরে। ভেসে আসে ভারিক্কি কণ্ঠস্বর, বাবা আমায় ডেকেছ?”

“ও প্রমথ, ভিতরে এসো, বিশ্বনাথবাবু আহ্বান জানান।

প্রমথনাথ পর্দা সরিয়ে ঢুকেই ঘরে দু'জন অপরিচিত যুবককে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বাপের সঙ্গে তার চেহারার মিল খুব কম। রং ময়লা। শরীরও কিঞ্চিৎ স্থূল। অর্ধেক মাথাজোড়া টাক পুরুষ্ট গোঁফ। নাক চাপা না হলেও, বাবার তীক্ষ্নতা নেই। পরনে ফুল শার্ট ও ট্রাউজার্স। চোখে চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা। পায়ে জুতোবিহীন মোজা।

“বোসো,” পুলকের সামনের চেয়ারটা দেখালেন বিশ্বনাথবাবু।

প্রমথনাথ আড়ষ্টভাবে বসলেন। বিশ্বনাথবাবু পুলকের দিকে চেয়ে বললেন, “এই আমার বড়ছেলে প্রমথ। আর এরা? হ্যা, বুঝলে প্রমথ, একটা দরকারে ডেকেছি তোমায়। এরা দু'জন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমি ওদের অ্যাপয়েন্ট করেছি। আমার একটা জিনিস হারিয়েছে বা বলতে পারো চুরি গেছে, সেই ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনের জন্য। তোমায় এই পুলক রায় কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর দিও।"

পুলক ও জয় হাত তুলে নমস্কার জানাল। ভদ্রতার খাতিরে প্রমথনাথ হাতজোড় করলেন বটে, তবে তাঁর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ভাব দেখে মনে হল এক্ষুনি বুঝি ফেটে পড়বেন রাগে। নেহাত অতি প্রতাপশালী ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাপের ভয়েই নিজেকে সামলে নিয়ে তিক্তস্বরে বললেন, “কী হারিয়েছে?”

পুলক চট করে বলে উঠল, “মিঃ মজুমদার, প্লিজ, সেটা এখন জানতে চাইবেন না, পরে জানাব। আমি এখন দু-চারটে প্রশ্ন করব। বেশি নয়। আপনি অফিস থেকে সবে। ফিরেছেন, টায়ার্ড।”

প্রমথনাথ কোনো কথা না বলে ঠোট টিপে কুদ্ধ দৃষ্টিতে পুলককে একবার দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

পুলক অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল, "আচ্ছা মিঃ মজুমদার, গত সোমবার অফিস থেকে ফিরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, এবং কখন ফিরলেন, যদি কাইন্ডলি বলেন।"

"গত সোমবার? সে কি মনে আছে ছাই!" গজগজ করেন প্রমথনাথ।

"একটু মনে করুন প্লিজ, পুলকের অনুরোধ।

খানিক গোজ হয়ে ভেবে নিয়ে প্রমথনাথ বললেন, "নেমন্তন্ন ছিল। বন্ধুর বাড়িতে, লেকের কাছে। ফিরেছি বোধহয় রাত সাড়ে-নটা দশটায়।"

বাড়ি ফিরে কী করলেন?"

"সোজা নিজের ঘরে ঢুকলাম।"

"বাথরুমে যাননি ?"

ও হ্যা,"চমকে যান প্রমথনাথ। "হ্যা হ্যা গিয়েছিলাম। পথে বৃষ্টির জল জমেছিল। পাশ দিয়ে মোটর যেতে জলকাদা ছিটকে লাগে গায়ে। তাই বাড়ি এসেই বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে যাই। আর-একবার বাথরুমে যাই মিনিট পনেরো কুড়ি বাদে, শোওয়ার ঠিক আগে।"

"আচ্ছা সেদিন কি আপনি রাবার সোলের জুতোটা পরে বেরিয়েছিলেন?"

"হা!" বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে উত্তর দেন প্রমথনাথ। প্রথমবার কি বাইরের জুতো, পোশাক পরেই সোজা বাথরুমে ঢুকেছিলেন?"

"আর দ্বিতীয়বার ?"

"চটি পায়ে। ঘরের পাজামা আর গেঞ্জি পরে।"

"জুতোটা কোথায় ছেড়ে রেখেছিলেন, ঘরে?"

"না, বাইরে। আমার দরজার পাশে।"

"নোংরা জুতোয় কাদা লেগেছিল, তাই ঘরে ঢোকাইনি। এটা আমার অভ্যেস।" প্রমথনাথ একবার বিশ্বনাথবাবুর দিকে চাইলেন। জয়ের মনে হল, এই অভ্যেস তিনি তার বাবার কাছ থেকে হয়তো পেয়েছেন।

পুলক নিজের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে প্রমথনাথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা মিঃ মজুমদার, বাথরুমে যাওয়ার সময় আপনি কি আপনার বাবার ঘরে উকি দিয়েছিলেন?"

"ঠিক মনে আছে?"

"মানে! কী বলতে চাইছেন? আমি মিথ্যে বলছি?" প্রমথনাথ তেতে ওঠেন। "আমি বাথরুমের দরজা পেরিয়ে এক পা-ও এগুইনি।"

ব্যস, ব্যস। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পুলক যেন লজ্জিত। রাগ করবেন না, স্রেফ রুটিন কোয়েশ্চেন। আর আপনাকে আটকৰ না। প্রয়োজন হলে পরে কথা হবে। একটি অনুরোধ। আমাদের সঙ্গে আপনার কী কথাবার্তা হল, এখন তা জানাবেন না কাউকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে, বিশ্বনাথবাবুর মোকদ্দমার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। আমরা ব্যারিস্টার ব্যানার্জির 'অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

প্রমথনাথ ইতস্তত করে বললেন, কিন্তু কী চুরি গেছে।" "পরে শুনতে পাবেন," অমায়িক হেসে জানাল পুলক।

"ননসেন্স!" প্রমথনাথ উঠে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। পুলক ঘড়ি দেখে বলল, 'ছটা চল্লিশ। বিশ্বনাথবাবু, একবার গোবিন্দকে ডাকবেন?"

"গোবিন্দ," হাঁক দিলেন বিশ্বনাথবাবু। গোবিন্দ ধারেকাছেই ছিল। দ্রুত হাজির হল। পুলক জিজ্ঞেস করল, "গোবিন্দ চন্দ্রনাথবাবু ফিরেছেন?

"আচ্ছা, শিবপদবাবুকে ডেকে আনতে পারবে? ওর দোকানেই পাবে বোধহয়। বলবে বিশ্বনাথবাবু ডাকছেন। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এই ঘর অবধি।"

গোবিন্দ বড়বাবুর দিকে তাকাল। বিশ্বনাথবাবু ইঙ্গিত করলেন—যাও যা বলছেন করো। গোবিন্দ চলে গেল।

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হয়। "দাদু," দরজার বাইরে মৃদু গলা শোনা গেল। "শিবু, এসো।" বিশ্বনাথবাবু ডাকলেন।

একটি বছর পঁচিশের যুবক পর্দা সরিয়ে ছাল ঢুকে পুলকদের দেখে থমকে গেল। রোগ। চোয়াড়ে চেহারা। রং কালো। মাঝারি লম্বা। হালের এক বিখ্যাত ফিল্মস্টারের ছাদে মাথার টেরি। পরনে হলুদ রঙা পাঞ্জাবি ও ট্রাউজার্স। পা খালি।

শিবু বিশ্বনাথবাবুকে বলল, "আমায় ডেকেছেন?"

', বোসো," ফাকা চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন বিশ্বনাথবাবু, "শোনো, এই এঁরা হচ্ছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার একটা জিনিস চুরি গিয়েছে। আমি এদের ভার দিয়েছি ইনভেস্টিগেশনের। এরা তোমায় কিছু প্রশ্ন করবেন। উওর নিও।" তিনি পুলককে বললেন "এই হচ্ছে শিবপদ মজুমদার। সম্পর্কে আমার নাতি।

পুলক এবার কিন্তু নমস্কার জানাল না। গাট হয়ে বসে শুধু একবার মাথা ঝাকাল। "আঁ, চুরি! কী চুরি?" শিবপদ অবাক।

"সেটা পরে জানতে পারবেন,"

পুলকের জবাব। "ও!" সন্ত্রস্ত ভাবে বসল শিবু।

পুলক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা শিবপদবাবু, গত সোমবার রাতে আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন ক'টায়?"

"সোমবার?" মুখ নিচু করে একটু ভেবে নিয়ে শিবু বলল, "এই রাত ন'টা নাগাদ হবে। দোকান থেকে বেরিয়ে খানিক গল্পগুজব করে তারপর বাড়ি ফিরি।"

"খেলেন ক'টায়?"

"বাড়ি ফিরেই।"

"খাবার পরে কী করলেন?"

খানিকক্ষণ বই পড়ি ঘরে বসে, তারপর শুই।”

“একটা রহস্য পত্রিকা।”

কখন শুলেন?”

“ঠিক মনে নেই। এই রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা হবে।” “ঘর থেকে আর বেরোননি?"

না। ও হ্যা, বাথরুমে গিয়েছিলাম একবার শোবার আগে।”

“বাথরুমে গিয়েই ফিরে এসেছিলেন?”

“আচ্ছা, ওই সময় আপনি বিশ্বনাথবাবুর ঘরে উকি দিয়েছিলেন বা ঢুকেছিলেন কি?"

“মানে? আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন? চোর ভাবছেন? রীতিমতো চটে ওঠে শিবপদ।”

‘না, না, সন্দেহ-টন্দেহর ব্যাপার নয়। স্রেফ রুটিন কোয়েশ্চেন। তা ছাড়া জিনিসটা যে এই ঘর থেকেই গিয়েছে ভাবছেন কেন?"

“ও! মানে আমি তাই ভাবলাম। না, আমি দাদুর ঘরের দিকে যাইনি বা ঢুকিনি।"

“ঠিক আছে, ঠিক আছে," পুলক একটু নড়েচড়ে বসে বলল, “আচ্ছা আপনি অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পুষছেন কন্দিন?” জেরা হঠাৎ হবির প্রসঙ্গে মোড় নিতে শিবু থতমত খেয়ে আমতা-আমতা করল, “অ্যাকোয়ারিয়াম? মাছ? তা তিন বছর।”

মাছ মরেছে কি এর মধ্যে?”

ও, মরেছে কয়েকটা।" শিবুর সন্দিগ্ধ ভাব দেখে মনে হল যে, সে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না পুলকের উদ্দেশ্য।

পুলক আনমনে গলা, গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, “আমার অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ যে কেন বাঁচছে না, ধরতে পারছি না। দু-দু'বার সব মরে

গেল,” বলতে বলতেই সে শিকুর দিকে তাকিয়ে গলা পালটে ঈষৎ ব্যঙ্গ-মেশানো স্বরে বলে উঠল, 'কী, চিনতে পেরেছেন? চিচিং ফাক।”

জয় সচকিত হয়ে দেখল, শিবু স্তম্ভিতভাবে পুলকের দিকে চেয়ে আছে।

“কী ব্যাপার?" কিছু একটা রহস্য আঁচ করে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

“ব্যাপার এই..." পুলক তার বাঁ হাতের চেটোর উলটো দিক মেলে ধরল বিশ্বনাথবাবর দিকে। জয় দেখল, পুলকের ওই হাতের অনামিকায় একটি আংটি, দেখে মনে হয় সোনার। এবং তাতে একটি স্বচ্ছ সাদা বড়সড় পাথর বসানো। নিওনবাতির উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে পাথরটা। জয় আগে কখনও পুত্রের হাতে কোনো আংটি দেখেনি।

“আরে, এই তো আমার সেই আংটি, বিশ্বনাথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

পুলক আংটিটা খুলে বিশ্বনাথবাবুর হাতে দিল। তিনি সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, “হু, ঠিক তাই। কোথায় পেলে?”

বারান্দায় অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে," পুলক জবাব দেয়, "শিববাবু এটা চুরি করে ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাই ওটা আমার হাতে দেখে ভারি অবাক হয়েছেন।”

“মিথ্যে কথা। কী যা-তা বলছেন?” প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ায় শিবুবাবু।

পুলক বাকা হেসে বলল, 'বসুন শিববাবু, বসুন। উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। আপনার খেয়াল ছিল না যে, সিড়ির মুখে সারা রাত একটা বাল্ব জ্বলে। আর বারান্দার এই অংশ নিচে মালির ঘর থেকে দেখা যায়।”

‘মালির ঘরের উঠোনে তখন কেউ ছিল না, আমি সেটা দেখেছি।" তারস্বরে ঘোষণা করল শিবু।।

“বটে, সেটাও লক্ষ রেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মালির ঘরের জানলা দিয়ে কেউ আপনাকে দেখে থাকলে অন্ধকারে তা আপনার নজরে না পড়াই স্বাভাবিক। যাক গে, আর মিছিমিছি প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আমার কাছে

আপনার অপরাধের আরও মোক্ষম কিছু প্রমাণ আছে। দোষ অস্বীকার করলে ব্যাপারটা হয়তো আরও জটিল হবে। আপনার দাদুকে হয়তো পুলিশ ডাকতে বাধ্য করবেন।” শিবপদ ফ্যাকাশে মুখে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে কারও মুখে কথা নেই। আওয়াজ বলতে শুধু, খাড়া-হয়ে-বসা বিশ্বনাথবাবুর জোরালো শ্বাস-প্রশ্বাস। তা তার মুখ রাগে টকটকে। মনে হল উনি বুঝি মেরেই বসবেন শিবপদকে।

তবে বিশ্বনাথবাবু সামলে নিলেন নিজেকে। শিবপদকে লক্ষ করে চাপা তীব্র কণ্ঠে কেটে-কেটে উচ্চারণ করলেন, “খাও, বেরিয়ে যাও। গেট আউট। আর, কালকের মধ্যে তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তোমার আর মুখদর্শন করতে চাই না। মনে থাকে যেন।”

নতমস্তকে বেরিয়ে গেল শিবপন। বিশ্বনাথবাবু খানিক গুম হয়ে রইলেন, তারপর পুলককে বললেন, “তুমি ঠিক ধরেছ ওই যে অপরাধী সন্দেহ নেই। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে, তুমি বুঝলে কীভাবে? এমন কী আংটিটা অবধি উদ্ধার করলে, আশ্চর্য!"

পুলক হাসিমুখে বলল, "কৃতিত্বটা অবশ্য আমার একার বলা উচিত হবে না। এর মধ্যে নিশিকান্তবাবুর ভাগও অনেকখানি।”

"নিশিকান্ত! মানে?”

“তা হলে একটা গোড়া থেকেই বলি," বলল পুলক, “আপনার ঘরে আপনি এবং গোবিন্দ ছাড়া আর কারও পায়ের ছাপ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। আলমারির লকারে কাঠের বাক্স দুটোতেও আপনার ছাড়া আর কারও আঙুলের ছাপ ছিল না। হয়তো শিবু গ্লাভস পরে এসেছিল। তবে একটা ইমপর্টেন্ট পাওয়া যায়, একজোড়া জুতোর ছাপ। খাজ কাটা রাবার-সোলের জুতো। গোবিন্দর থেকে জানলাম যে, ওই ধরনের জুতোর মালিক এ-বাড়িতে একজনই। আপনার বড় ছেলে প্রমথবাবু। কাজেই গোড়ায় সন্দেহটা তার দিকেই ঝোকে।” | "তবু আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগে। প্রমথবাবু কি এতই বোশ হবেন যে, চুরি করতে এসে নিজের কাদামাখা জুতোর ছাপ রেখে যাবেন ঘরে? খালি পায়ে কার্যোদ্ধার করাই তো উচিত। সামান্য বুদ্ধি থাকলেই লোকে অর্থাৎ চোরে তাই করবে। কোথায় যেন গন্ডগোল। তখনই নিশিকান্তবাবুর আশ্চর্য শ্রবণশক্তির কথা

আমার মনে জাগল। প্রথমদিন এসেই খেয়াল করেছিলাম ব্যাপারটা। ঈশ্বর যখন কারও কোনো ইন্দ্রিয় কেড়ে নেন, সাধারণত তখন হতভাগ্যের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি অনেক বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। নিশিকান্তবালুরও তাই হয়েছে। গোবিন্দ বলল যে, এই বাড়ির প্রত্যেকের পায়ের শব্দ উনি নাকি চেনেন। ওঁর ঘরের সামনে দিয়ে চেনা কেউ গেলে ঠিক ধরতে পারেন। আর অচেনা কারও পায়ের শব্দ পেলেই, কে যাচ্ছে, প্রশ্ন করা তার স্বভাব।”

“গোবিন্দ বলেছিল, হাঁপানির জন্য নিশিকান্তবাবু প্রায়ই রাতে ঘুমোত পারেন না। তাই ভাবলাম, দেখা যাক এ-রহস্যের কোনো কিনারা উনি দিতে পারেন কি না। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নিশিবাবু সোমবার রাতে জেগেই ছিলেন এবং ওর ঘরের সামনে দিয়ে রাত সাড়ে ন'টা দশটার পর তিনজনের যাতায়াতের শব্দ শুনেছেন।”

“প্রথমে নিশিৰাৰু পরপর দু'বার প্রমথবাবুর পায়ের শব্দ শোনেন। প্রথমবার জুতো পায়ে। পরেরবার রাবারের চটি পায়ে। প্রমথবাবু দু’বারই সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলেন। তারপর বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যান। বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি দেওয়া আর খোলার আওয়াজ নিশিবাবুর কান এড়ায়নি।” |
“এর পর যায় গোবিন্দ। ও সোজা গিয়ে নিজের ঘরে বিল দেয়। ওর খিল দেওয়ার শব্দটা নিশিবাবুর পরিচিত।”

"গোবিন্দ চলে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ বাদে ঘরের সামনে দিয়ে অচেনা পায়ের প পেয়ে নিশিবাবু যথারীতি প্রশ্ন করেন, “কে?” মৃদু স্বরে উত্তর হয়, আমি'। শিবপনর গলা। আসলে শিবপদ তখন প্রমথবাবুর বাইরে ছেড়ে রাখা খাঁজকাটা রাবার-সোলের জুতোটা

অনুসন্ধানীর রহসফu১৮১ পায়ে গলিয়ে পা টিপেটিপে আসছিল। তাই তার পদশব্দ নিশিবাবুর কেমন অচেনা ঠেকে।”

“শিবপদ কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাথরুমে ঢোকেনি। অন্তত মিনিট-দশেক বাদে নিশিবাবু বাথরুমের দরজা বন্ধের আওয়াজ পান। এই সময়টুকুর মধ্যেই শিবপদ আপনার ঘর থেকে আংটি চুরি করে। বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজও হয় খুব তাড়াতাড়ি। শিবপদ ফিরে যায় তেমনি সন্তর্পণে। প্রমথবাবুর জুতো বাইরে যথাস্থানে রেখে সে নিজের ঘরে ঢোকে। প্রমথবাবুর জুতো পায়ে দেওয়ার কারণ, যদি চুরি টের পাওয়া যায়, বিশ্বনাথবাবুর ঘরে জুতোর ছাপ দেখে, দোষটা

প্রমথবাবুর ঘাড়েই চাপবে। হয়তো শিবপদর কোনো পুরনো রাগ আছে প্রমথবাবুর ওপর, তাই এক ঢিলে দুই পাখি বধের ফন্দি।"

বিশ্বনাথবাবু চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন, "স্কাউড্রেল। বুঝেছি, সেদিন প্রমথর কাছে বকুনি খেয়েছিল, তারই প্রতিশোধ। ও প্রমথর কাছেও টাকা ধার করেছে। শোধ দিচ্ছে না। তাই তাড়া লাগিয়েছে প্রমথ।"

"আপনি বোধহয় জানেন না," বলল পুলক, "শিবপদ জুয়া খেলা শুরু করেছে। এটাই ওর টাকার টানাটানির কারণ।"

ফের খানিকক্ষণ রক্তচক্ষু মেলে ফোঁস-ফোস করে বিশ্বনাথবাবু বললেন, "আচ্ছা, সে রাতে নিচে থেকে কেউ কি দেখতে পেয়েছিল শিবুকে আমার ঘরে ঢুকতে?"

"আরে না, ওটা আমার একটা চাল," হেসে বলল পুলক, "শিবপনকে ওই বলে আবাড়ে দিয়ে দোষ স্বীকার করালাম।"

"কিন্তু আংটিটা উদ্ধার, মানে ওটা যে অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকনো ছিল, তুমি বুঝলে কীভাবে?" বিশ্বনাথবাবু থই পান না।

"অনুমান এবং আমাদের ভাগ্য," পুলকের জবাব, "সন্দেহটা যখন শিবপদর ওপর দানা বাঁধল, তখন ভাবতে লাগলাম ও আংটিটা নিয়ে কী করেছে? ইতিমধ্যে খোঁজ পেয়েছিলাম যে দোকানের এই পার্টনারের কাছে ওর মোটা টাকা দেনা রয়েছে। কিন্তু এই তিনদিনের ভিতর সে দেনা শোধ হয়নি। ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও এই কদিনের টাকা জমা পড়েনি। অতএব আংটি বোধহয় ও এখনও বিক্রি করতে পারেনি। কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আর আংটি বিক্রি করলেও অতখানি নগদ টাকা কোথায় রাখতে পারে? নিজের ঘরে রাখা বিপজ্জনক। যা কড়া প্রকৃতির দাদু। আংটি মিসিং হয়েছে টের পেলে হয়তো পুলিশেই খবর দেবেন। তখন ঘর সার্চ হবে। দোকানে রাখলে পার্টনারদের চোখে পড়তে পারে। কারও কাছে গচ্ছিত রাখলে জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা। এসব ভাবতে ভাবতেই দুটো জিনিস নজরে এল, বারান্দায় ক্যাকটাসের টব এবং অ্যাকোয়ারিয়াম।"

"প্রত্যেক ক্যাকটাসগাছের গোড়ায় নানা রঙের নুড়িপাথর জড়ো করা। এইভাবেই সাজায় ক্যাকটাসটব। টবের মাটি কদাচিৎ খোঁড়াখুড়ির দরকার হয়।

অতএব পাথর নাড়াচাড়াও হয় না। মাঝেমধ্যে গাছের ওপর থেকে জল ঢেলে দিলেই যথেষ্ট। অ্যাকোয়ারিয়ামেও রয়েছে প্রচুর ছোট-ছোট পাথর আর বালি। এবং অ্যাকোয়ারিয়ামে শিবপদ ছাড়া আর কেউ হাত দেয় না। সুতরাং ক্যাকটাসের টবে বা অ্যাকোয়ারিয়ামের পাথর-বালির তলায় আংটিটা লুকিয়ে রাখা যায়। ভাবলাম, দেখি খুলে। গোবিন্দকে চা

চআনতে সরিয়ে দিয়ে এবং জয়কে আপনার ঘরে ছুতো করে আটকে রেখে চটপট খুজলাম। প্রথমে ক্যাকটাসের টবগুলোতে পাথরের ভিতরে। কারণ দায়টা প্রমথবাবর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা ছিল। কিন্তু টবে পেলাম না। তখন অ্যাকোয়ারিয়ামের পাথর একট হাঁটকাতেই আংটি বেরিয়ে পড়ল। লুকোবার আদর্শ জায়গা বটে। চোখের সামনে, অথচ অতি নিরাপদ। কে সন্দেহ করবে ওখানে?”

“তা তখনই বললে না কেন? এত জেরা-টেরার প্রয়োজন কী ছিল?” বিশ্বনাথবাবু যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

পুলক বলল, “আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। যদি ভুল হয় ? যদি নিশিবাবুর কান বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে? যদি আর কেউ আংটিটা চুরি করে অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকিয়ে রেখে থাকে?”

“আংটিটা আমার বুক-পকেটে ছিল। প্রমথবাবুকে জেরা করতে করতে এক ফাকে আংটি বার করে আমার বাঁ হাতে পরে নিয়ে হাতটা এমনভাবে রাখি, যাতে সেটা প্রমথবাবুর নজরে পড়ে অথচ আপনার বা জয়ের নজরে না পড়ে। লক্ষ করলাম, আংটিটা দেখেও প্রমথবাবুর কোনো বিকার হল না। বুঝলাম উনি নির্দোষ। ফের আংটি ঢুকে গেল আমার পকেটে। শিবপদর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই একই কায়দা করলাম। দেখলেন তো, আংটিটা দেখেই শিবপদ কীরকম চমকে উঠল। একদম থ মেরে গেল। বেশি চালাকি করতে গিয়েই শ্রীমান ফেঁসে গেলেন। খালি পায়ে নিঃশব্দে গিয়ে চুরি করলে হয়তো ও নিশিবাবুর কান এড়াতে পারত।”

“যদি আংটি না পেতে?” এতক্ষণে মুখ খোলে জয়।

পুলক বলল, “তা হলে অন্যভাবে চাপ দিয়ে ওকে দোষ স্বীকার করাতাম। আমার অনুমান যখন খেটে গিয়েছে, তখন ও পার পেত না। কিছু সময় বেশি

লাগত এই যা। তবে ইতিমধ্যে আংটিটা বিক্রি করে ফেললে সেটা উদ্ধার করা সম্ভব হত কি না কে জানে।”

বিশ্বনাথবাবু হাত বাড়িয়ে পুলকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, “কনগ্রাচুলেশনস ইয়াংম্যান। তোমার উন্নতি হোক।”

পুলক স্মিত মুখে বলল, “আমার কাজ শেষ। এবার তাহলে ছুটি ?”

“এক মিনিট,” বাধা দিলেন বিশ্বনাথবাবু। তিনি তোশকের তলা থেকে একটা ব্যাঙ্কের চেক-বই বের করে বালিশের পাশ থেকে কলম নিয়ে বললেন, “তোমার ফিজ, কত টাকা লিখব?”

“পাঁচশো,” জানাল পুলক।

“উহু, ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ। তারপর খসখস করে একটা চেক লিখে পাতাটা ছিড়ে পুলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এক হাজার দিলাম। তোমার ন্যায্য পাওনা।" “ধন্যবাদ,” পুলক হাসি-মুখে হাত বাড়াল।

**সমাপ্ত**

**জোনাকিদের বাড়ি এক পেখম স্মরণজিৎ চক্রবর্তী**